بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ জুন, ২০২৩ মোতাবেক ০২ এহসান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বদরী সাহাবীদের জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক, তাঁদের পরিচয় এবং তাঁদের বিভিন্ন কুরবানী সম্পর্কে আমি খুতবায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছি। অনেকেই এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে লিখেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত যদি বর্ণনা করা না হয় তাহলে বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, কেননা মূল কেন্দ্রবিন্দু তো ছিল তাঁর সত্তা; যাঁর চতুষ্পার্শ্বে সাহাবীরা প্রদক্ষিণ করতেন, যাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সাহাবীরা ত্যাগের সুমহান মান অর্জন করেছেন, আর নিত্য নতুন রীতি-পদ্ধতি শিখেছেন, তৌহীদের প্রচার-প্রসার এবং স্বয়ং এর বাস্তব উদাহরণ হওয়ার সেই মান প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি ও আল্লাহ্ তা'লার একান্ত প্রিয়ভাজন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কাজেই, তাঁর (সা.) জীবনী বর্ণনা করাও আবশ্যক।

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে খুতবা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু তাঁর (সা.) জীবনচরিত এমন যে, এর আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। (তাঁর) এক একটি বৈশিষ্ট্য এমন যে, তা কয়েক খুতবায়ও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আর এই জীবনচরিত বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা হতেও থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। বরং প্রতিটি খুতবা এবং বক্তৃতায় কোনো না কোনো দিক, কোনো না কোনো আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েও থাকে, কেননা এটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন। একে বাদ দিয়ে আমাদের ধর্ম, আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না আর আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত শরীয়তের ওপর আমল করাও সম্ভব নয়। যাহোক, এখন আমি বদরের যুদ্ধের বরাতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করব আর এই ধারা আগামী কয়েকটি খুতবায়ও অব্যাহত থাকবে। তাঁর (সা.)-এর আদর্শই সাহাবীদেরকে নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রেরণা জুগিয়েছে। আর এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা গাজী, শহীদ, আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র এবং আল্লাহ্র সন্তোষভাজনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার দৃষ্টান্ত আমরা তাদের জীবনে দেখেছি। অতএব এই যুদ্ধের বরাতেও মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বর্ণনা করা আবশ্যক। যুদ্ধের ঘটনাবলীর পূর্বে সেসব কারণ বর্ণনা করাও আবশ্যক যে কারণে যুদ্ধ হয়েছিল। এ কারণে আমি প্রথমে কিছুটা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করব। এই পটভূমিতে মহানবী (সা.)-এর জীবনী এবং তাঁর আনীত অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়।

বদরের যুদ্ধের কারণগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর মক্কী জীবনে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর যেসব যুলুম-নির্যাতন করেছে আর ইসলামকে নির্মূল করার জন্য যেসব ষড়যন্ত্র তারা করেছে তা সকল যুগে, যে–কোনো অবস্থায় যে কোন দু'টি জাতির মাঝে যুদ্ধ বাঁধার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, চরম অসম্মানজনক ঠাট্টাবিদ্রূপ এবং অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক তীর্যক তিরস্কার ও ভর্ৎসনা ছাড়াও মক্কার কাফিররা

মুসলমানদেরকে এক খোদার ইবাদত ও একত্ববাদের ঘোষণা হতে বাহুবলে বাধা প্রদান করেছে। তাদেরকে চরম নির্দয়ভাবে মারধর করেছে। অন্যায়ভাবে তাদের ধনসম্পদ গ্রাস করেছে। তাদেরকে বয়কট করে ধ্বংস ও বিনাশ করার চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে কতককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের মহিলাদের অসম্মান করেছে, এমনকি এসব যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছে কিন্তু কুরাইশরা তারপরও ক্ষান্ত হয় নি বরং নাজ্জাশীর দরবারে নিজেদের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে চেষ্টা করে– যেন কোনোক্রমে এই মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসে আর কুরাইশরা তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে সফল হয় অথবা যেন তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়। এরপর মুসলমানদের মনিব ও নেতাকে চরম কষ্ট এবং সকল প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, যাঁকে তারা প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তায়েফে কুরাইশদের সাঙ্গপাঙ্গরা খোদা তা'লার নাম নেয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি পাথর বর্ষণ করে, এমনকি তাঁর (পুরো) দেহ রক্তেরঞ্জিত হয়ে যায়। অবশেষে মক্কার জাতীয় সংসদে কুরাইশদের সকল গোত্রের প্রতিনিধিবর্গের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যাতে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে যায় আর চিরতরে তৌহীদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর এই হিংস্র রেজুলেশনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কুরাইশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত মক্কার যুবকরা রাতের বেলা দলবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে হামলে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করেন আর তিনি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সওর গুহায় আশ্রয় নেন। এসব অত্যাচার-নিপীড়ন ও রক্তপিপাসু রেজুলেশন কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর নয় কী? এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো বিবেকবান ধারণা করতে পারে কি যে, মক্কার কুরাইশরা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ ছিল না? এছাড়া কুরাইশদের এসব যুলুম-অত্যাচার কি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল না? পৃথিবীর কোনো আত্মভিমানী জাতি যারা আত্মাহুতির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় নি, এহেন পরিস্থিতি সত্ত্বেও কুরাইশরা মুসলমানদেরকে যে ধরনের আল্টিমেটাম দিয়ে রেখেছিল তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে কী? মুসলমানদের পরিবর্তে অন্য কোনো জাতি হলে নিঃসন্দেহে তারা এর অনেক আগেই কুরাইশের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হতো কিন্তু মুসলমানদেরকে তাদের মনিবের পক্ষ থেকে ধৈর্য এবং মার্জনার নির্দেশ ছিল। যেমন তিনি (রা.) লিখেছেন, মক্কার কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন যখন অনেক বেড়ে যায় তখন আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কুরাইশের মোকাবিলা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, **ইন্নি উমিরতু বিল আফয়ী ফালা তুক্বাতিলু** অর্থাৎ আমার প্রতি এখনও ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে তাই আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিতে পারি না। অতএব সাহাবীরা ধর্মের খাতিরে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছেন কিন্তু ধৈর্যহারা হন নি। এমনকি কুরাইশের অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে যেতে থাকে এবং বিশ্বপ্রতিপালকের দৃষ্টিতে তারা শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা তাঁর বান্দাকে আদেশ দেন যে, তুমি এই জনপদ ছেড়ে চলে যাও, কেননা বিষয়টি এখন ক্ষমার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে আর অত্যাচারীর নিজ অপকর্মের পরিণাম ভোগ করার সময় এসে গেছে। অতএব মহানবী (সা.)-এর এই হিজরত কুরাইশের আল্টিমেটাম গ্রহণ করার লক্ষণ ছিল আর এতে খোদার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত

ছিল, যা মুসলমান এবং কাফির উভয় (পক্ষই) বুঝতো। যেমন দ্বারুন্ নদওয়াতে (এটি কাবাগৃহের নিকটে কুরাইশদের শলা-পরামর্শের জায়গা ছিল) পরামর্শকালে জনৈক ব্যক্তি যখন এই প্রস্তাব দেয় যে, মহানবী (সা.)-কে মক্কা থেকে বহিস্কার করা হোক। তখন কুরাইশ নেতারা এই প্রস্তাবটি এজন্য নাকচ করে দেয় যে, যদি মুহাম্মদ (সা.) মক্কা ত্যাগ করেন তাহলে মুসলমানরা অবশ্যই আমাদের আল্টিমেটাম গ্রহণ করে আমাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হবে। আর মদীনার আনসারের সামনেও যখন আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মহানবী (সা.)-এর হিজরতের প্রশ্ন আসে তখন তাঁরা তৎক্ষণাৎ বলে, এর অর্থ হলো আমাদেরকে গোটা আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর মহানবী (সা.) স্বয়ং যখন মক্কা থেকে বের হন আর তিনি (সা.) মক্কার বসতির প্রতি আক্ষেপের সাথে দৃষ্টিপাত করে বলেন, হে মক্কা! তুই আমার কাছে সকল জনপদের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলি, কিন্তু তোর বাসিন্দারা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও একথাই বলেন, তারা আল্লাহ্‌র রসূলকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে; এখন এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে। সারকথা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত মহানবী (সা.) মক্কায় অবস্থান করেছেন তিনি (সা.) সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করেছেন, কিন্তু কুরাইশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি, কেননা প্রথমত, কুরাইশের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি অনুযায়ী তাদের জন্য সত্য স্পষ্ট হওয়া বা তাদের শাস্তি পাওয়ার যৌক্তিক প্রমাণাদি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক ছিল, আর এর জন্য অবকাশ আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল যে, মুসলমানরা যেন ধৈর্য ও ক্ষমার সেই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যার পর চুপ থাকা আত্মহত্যার নামান্তর হবে, যা কোনো বুদ্ধিমানের নিকট সুন্দর কাজ বিবেচিত হতে পারে না। তৃতীয়ত, মক্কায় কুরাইশের এক ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল আর মহানবী (সা.) সেই শহরের একজন নাগরিক ছিলেন। কাজেই সুনাগরিক হওয়ার দাবি ছিল, যতদিন মক্কায় অবস্থান করতেন উক্ত সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং স্বয়ং কোনো শান্তি ভঙ্গকারী বিষয় ঘটতে না দেয়া। বিষয় যখন ক্ষমার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি যেন সেখান থেকে হিজরত করে চলে যান। চতুর্থত, এটিও আবশ্যক ছিল যে, যতদিন খোদা তা'লার দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর জাতি তাদের কৃতকর্মের ফলে শাস্তিযোগ্য না হবে ও তাদেরকে ধ্বংস করার সময় না এসে যাবে ততদিন পর্যন্ত তিনি (সা.) যেন তাদের মাঝেই অবস্থান করেন। আর যখন সেই সময় এসে যায় তখন তিনি যেন সেখান থেকে হিজরত করেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি অনুযায়ী নবী যতদিন পর্যন্ত নিজ জাতির মাঝে উপস্থিত থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক শাস্তি আসে না। আর যখন ধ্বংসাত্মক শাস্তি আসার সময় হয় তখন নবীকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। এসব কারণে মহানবী (সা.)-এর হিজরত নিজের মাঝে বিশেষ ইঙ্গিত বহন করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সীমালঙ্ঘনকারী জাতি তা চিনতে পারে নি, বরং অত্যাচার ও নির্যাতনে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। নতুবা যদি তখনও কুরাইশরা বিরত হতো এবং ধর্মের বিষয়ে জোর খাটানো পরিত্যাগ করত আর মুসলমানদেরকে শান্তিতে জীবন যাপন করার সুযোগ দিত তাহলে খোদা হলেন **আরহামুর রাহিমীন** বা সচয়ে বড় দয়ালু আর তাঁর রসূলও **রহমাতুল্লিল আ'লামীন** তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হতো আর আরবকে সেই রক্তপাতের দৃশ্য দেখতে হতো না যা তারা দেখেছে। কিন্তু ভাগ্যের লেখা পূর্ণ হওয়ার ছিল। মহানবী (সা.)-এর হিজরত কুরাইশের

শত্রুতার আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করেছে। তারা পূর্বের চেয়েও প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

যেসব দরিদ্র ও অসহায় মুসলমান মক্কায় ছিল তাদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো ছাড়াও কুরাইশরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিল তা হলো, যখনই তারা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেছেন; (তখন) তারা মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হয় আর মক্কা উপত্যকার প্রত্যেকটি কোণায় তাঁর (সা.) সন্ধান করে এমনকি সওর গুহার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সাহায্য করেন আর কুরাইশদের চোখে এমন পর্দা লেপন করেন যে, একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছেও তারা ব্যর্থ ও বিফল হয়ে ফিরে যায়। তারা যখন এই অনুসন্ধানে হতাশ হয় তখন তারা সাধারণ ঘোষণা প্রদান করে যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারবে তাকে একশ' উট, যা বর্তমান মূল্যে প্রায় বিশ হাজার রুপি হয়, (এটি সেই যুগের কথা যখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এটি লিখেছেন, অর্থাৎ ১৯৩১ সালের কথা; বর্তমানে এটি কোটি কোটি টাকার বিষয়; তাকে একশ' উট দেয়া হবে। অর্থাৎ কোটি টাকার পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়।) উক্ত পুরস্কারের লোভে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক তাঁর (সা.) সন্ধানে চতুর্দিকে বের হয়ে যায়। যেমন সুরাকা বিন মালেকের পিছু ধাওয়া করা উক্ত পুরস্কারের ঘোষণার কারণেই ছিল। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রেও কুরাইশকে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়েছে। যদি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দু'টি জাতির মাঝে যুদ্ধ বাধার জন্য শুধুমাত্র এই একটি কারণই যথেষ্ট যে, কোনো জাতির মনিব ও নেতার মাথার মূল্য হিসেবে অন্য জাতি এভাবে পুরস্কার নির্ধারণ করবে। অনুরূপভাবে যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন কুরাইশরা মদীনার নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সহচরদের নামে হুমকি দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করে। তারা লিখেছে যে,

তোমরা আমাদের সাথীকে আশ্রয় দিয়েছো, আর আমরা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে হবে অথবা তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। অন্যথায় আমরা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব আর তোমাদের নারীদের আমাদের অধীনস্ত করব। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার প্রতিমাপূজারী সঙ্গীরা যখন এই পত্র পায় তখন তারা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এ সংবাদ লাভ করেন তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, কুরাইশরা তোমাদের যে হুমকি দিয়েছে তা তোমাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় হুমকি। অথচ তারা তোমাদের ততটা ক্ষতিসাধন করতে পারবে না যতটা তোমরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করবে। তোমরা কি নিজেদের পুত্র ও ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে চাও? যেহেতু তাদের মধ্য থেকে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর এসব কথা শোনার পর এদিক সেদিক চলে যায়, অর্থাৎ তাকে (উবাইকে) ছেড়ে যায়। অপরদিকে মক্কার কুরাইশরা ঘুরে ঘুরে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করে। যেমন এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেন,

কথার এখানেই শেষ নয়, বরং কুরাইশরা যখন দেখল যে, অওস ও খাযরাজ গোত্র মুসলমানদের আশ্রয় দেয়া থেকে বিরত হবে না এবং মদীনায় ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তারা আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করে

তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে আরম্ভ করে। আর কাবা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে কুরাইশের যেহেতু সমগ্র আরব গোত্রগুলোর ওপর এক বিশেষ প্রভাব ছিল তাই কুরাইশের উস্কানিতে বেশ কয়েকটি গোত্র মুসলমানদের প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়। আর মদীনার অবস্থা এমন হয়ে যায় যেন এর চতুষ্পার্শ্বে কেবল আগুন আর আগুন। যেমনটি এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে,

হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহবীগণ মদীনায় আগমন করেন এবং আনসাররা তাঁদেরকে আশ্রয় দেয় তখন সমগ্র আরব একটি ধনুকের ন্যায় অর্থাৎ একজোট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। অতএব সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা রাতের বেলাও অস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুমাত আর দিনের বেলাও সশস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করত। তারা একে অপরকে বলত যে, দেখুন! আমরা সে সময় পর্যন্ত বাঁচব কিনা জানি না যখন আমাদের শান্তিতে রাত্রি যাপনের সুযোগ লাভ হবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না। স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল দেখুন! হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) প্রথম প্রথম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতেন। এ যুগ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ

وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (সূরা আনফাল: ২৭)

অর্থাৎ "হে মুসলমানরা! সেই যুগকে স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে এবং তোমরা দেশে অনেক দুর্বল গণ্য হতে আর তোমরা এই ভয়ে ভীত থাকতে যে, লোকেরা ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ধ্বংস না করে দেয়। অতঃপর খোদা তা'লা তোমাদের আশ্রয় দেন এবং নিজ সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের সমর্থন করেন আর তোমাদের জন্য পবিত্র রিয্ক এর দ্বার উন্মুক্ত করেন। সুতরাং তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

এগুলো ছিল বহিরাগত আশঙ্কা, যা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মদীনার অভ্যন্তরিণ অবস্থাও ততটা অনুকূল ছিল না, যেমনটি কি-না এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন,

মদীনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা যা ছিল তা হলো, অওস ও খাযরাজ গোত্রের এক বৃহদাংশ তখনও শির্ক-এ প্রতিষ্ঠিত ছিল আর বাহ্যত যদিও তারা নিজ ভাই-বন্ধুদের সাথে ছিল কিন্তু অবস্থার দোলাচালের মাঝে একজন মুশরিকের বিশ্বাসই বা কি! আর দ্বিতীয়ত ছিল মুনাফিকরা, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু পর্দার অন্তরালে তারা ছিল ইসলামের শত্রু আর মদীনায় তাদের উপস্থিতি ভয়াবহ আশঙ্কার কারণ ছিল। তৃতীয়ত ছিল ইহুদীরা, যাদের সাথে যদিও একপ্রকার সন্ধিচুক্তি হয়েছিল কিন্তু ঐসব ইহুদীর দৃষ্টিতে সেই সন্ধিচুক্তির কোনো মুল্যই ছিল না। মোটকথা, এসব বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, স্বয়ং মদীনার অভ্যন্তরে এমন সব কারণ বিদ্যমান ছিল যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক গোপন বারুদের ভাণ্ডারের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না আর আরব গোত্রগুলোর সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সেই বারুদে আগুন লাগানো এবং মদীনার মুসলমানদের নিমিষেই উড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে যার চেয়ে স্পর্শকাতর পরিস্থিতি ইসলামে আর কখনো আসে নি, মহানবী (সা.)-এর প্রতি খোদা তা'লার ওহী অবতীর্ণ হয় যে, এখন তোমাদেরও ঐসব কাফিরের মোকাবিলায় তরবারি ধারণ করা উচিত যারা সম্পূর্ণ অন্যায়ের বশে তরবারি হাতে

নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে তরবারির জিহাদের ঘোষণা হয়ে যায়। তরবারির জিহাদের বিষয়ে সর্বপ্রথম আয়াত মহানবী (সা.)-এর প্রতি ২য় হিজরীর ১২ই সফর অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অবতীর্ণ হয় যখন কিনা মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যে গবেষণা করেছেন তদনুযায়ী সেই আয়াতের (অবতরণকাল) উক্ত তারিখ নির্ণীত হয়, কেননা এ সূরা সম্পর্কে (লেখা আছে) যে, কিয়দাংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কতক মদীনায়। যাহোক, উক্ত আয়াতের অবতরণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। এমন রেওয়ায়েতও আছে যে, হিজরতের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, কেননা মদীনায় আগমনের কিয়দকাল পরেই মহানবী (সা.) মদীনার আশপাশে কুরাইশ কাফেলাকে প্রতিহত করা এবং নিরাপত্তামূলক অন্যান্য দিক মাথায় রেখে সশস্ত্র দল প্রেরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই আয়াত হিজরতের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হোক বা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হোক- ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীদের সাথে যুদ্ধ করার এটিই ছিল প্রথম অনুমতি। আর মহানবী (সা.) সেই (মক্কা) রাষ্ট্রের বাইরে চলে এসেছিলেন, পূর্বে যে রাষ্ট্রের অধীনে ছিলেন। যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক থাকা অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করার অনুমতি নেই এবং তাঁর (সা.) নিজস্ব এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেই আয়াত যাতে আল্লাহ্ তা'লা (আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার) অনুমতি দিয়েছেন সেটি হলো সূরা হাজ্জের আয়াত বরং দু'টি আয়াত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (সূরা হাজ্জ: ৪০-৪১)

অর্থাৎ, যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'দের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্নাসীদের মঠ ও গীর্জা এবং ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হতো) যেখানে আল্লাহ্র নাম অনেক বেশি স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী।

অর্থাৎ এখানে সব ধর্মমতের ইবাদতগাহের নাম নিয়ে সকল ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। জিহাদ ফরজ হবার পর মহানবী (সা.) কাফেরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য প্রথমে চারটি কৌশল অবলম্বন করেন। যেমন এসব কৌশল সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

প্রথমত তিনি (সা.) স্বয়ং সফর করে আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তামূলক চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যেন মদিনার আশেপাশের এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মহানবী (সা.) বিশেষভাবে সেসব গোত্রকে প্রাধান্য দেন যারা কুরাইশদের সিরিয়া যাতায়াতের পথে বসবাস করত। কেননা সবার জন্য এটি বোধগম্য যে

এসব গোত্রের কাছ থেকেই মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বেশি সাহায্য নিতে পারত এবং যাদের শত্রুতা মুসলমানদের জন্য চরম বিপদের কারণ হতে পারত। দ্বিতীয়ত তিনি ছোট ছোট সংবাদ সংগ্রাহক দল মদিনার আশপাশের এলাকাগুলোতে প্রেরণ করা আরম্ভ করেন যেন তিনি কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারেন অধিকন্তু কুরাইশরাও যেন জানতে পারে যে, মুসলমানরা অসতর্ক নয় আর এভাবে মদিনা অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। ঐ দলগুলো পাঠানোর তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল যেন এর মাধ্যমে মক্কা ও আশেপাশের দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমানদের মদিনার মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হবার সুযোগ লাভ হয়। তখনও মক্কার এলাকায় বহু এমন লোক ছিল যারা অন্তরে মুসলমান ছিল, কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচারের কারণে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারত না আর দারিদ্র্য ও দুর্বলতার কারণে হিজরতের সামর্থ্যও তাদের ছিল না। কেননা কুরাইশরা এসব লোকদের হিজরতে বলপূর্বক বাঁধা দিত। চতুর্থ যে কৌশল তিনি অবলম্বন করেন সেটি হচ্ছে কুরাইশদের সেসব বানিজ্যিক কাফেলাগুলোর পথ রোধ করা আরম্ভ করেন যেগুলো মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে আসা যাওয়ার পথে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। কেননা এসব কাফেলা যে পথেই যাতায়াত করত সেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছড়াত আর এটা স্পষ্ট যে, মদিনার আশেপাশে ইসলামের শত্রুতার বীজ বপন করা মুসলমানদের জন্য খুবই বিপজ্জনক ছিল। এছাড়াও এই কাফেলাগুলো সর্বদা সশস্ত্র থাকত এবং যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এ ধরনের কাফেলার মদিনার এত পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করা কখনো মুসলমানদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। এছাড়া এও সত্য যে, কুরাইশদের জীবিকার বেশিরভাগই ব্যবসানির্ভর ছিল। এমতাবস্থায় কুরাইশদের দমন, তাদের নিষ্ঠুর কাজে বাধা দেয়া ও মিমাংসায় আসতে বাধ্য করার সবচেয়ে কার্যকর, নিশ্চিত ও ত্বরিত উপায় ছিল তাদের ব্যবসার পথ বন্ধ করে দেয়া। অতএব ইতিহাস সাক্ষী, যে বিষয়গুলো কুরাইশদেরকে পরিশেষে সন্ধির দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছিল সেগুলোর মধ্যে তাদের বানিজ্য কাফেলাগুলোকে প্রতিরোধ করা ছিল অন্যতম। সুতরাং এটি খুবই বিচক্ষণ কৌশল ছিল যা যথাসময়ে ফল বয়ে এনেছিল। এছাড়া কুরাইশদের এই কাফেলাগুলোর মুনাফা প্রায় সময় ইসলামকে নির্মূল করার চেষ্টায় ব্যয় করা হতো। বরং কিছু কাফেলা বিশেষভাবে এজন্যই প্রেরণ করা হতো যে লব্ধ পুরো মুনাফা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যায় করা হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা হতো ও আয় করা হতো। এ ক্ষেত্রে সবাই বুঝতে পারবে যে, এই কাফেলাগুলোকে বাধা দেয়া সম্পূর্ণভাবে একটি বৈধ উদ্দেশ্য ছিল।

যাহোক, এই ধারাবাহিক বর্ণনা চলতে থাকবে। বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। তাদের জানাযার নামাযও হবে। এদের মধ্যে একজনের জানাযা হাযের হবে যা মুকার্‌রম খাজা মুনিরুদ্দীন কমর সাহেবের। বাকিগুলো হবে গায়েবানা জানাযা। খাজা মুনিরুদ্দীন কমর সাহেব এখানে যুক্তরাজ্যেই থাকতেন। তিনি গত ২৭ মে তারিখে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া খায়রুদ্দিন সেখওয়ানী সাহেব (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। তার পিতা মওলানা কামরুদ্দীন সাহেবকেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অল্প বয়সে দেখেছিলেন এবং তিনিও তাঁকে অল্প বয়সে দেখেছিলেন অর্থাৎ শৈশব ছিল। তার পিতা মৌলবি কামরুদ্দীন সাহেব মজলিস খোদ্দামুল

আহমদীয়ার প্রথম কেন্দ্রীয় সদর ছিলেন। দেশ বিভাগের পর, অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার পর তারা পাকিস্তান চলে আসেন। এরপর খাজা মুনিরুদ্দীন সাহেব কিছুদিনের জন্য আফ্রিকার তানজানিয়ায় চলে যান। রাবওয়াতেও তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, এরপর তিনি ১৯৬৬ সালে সপরিবারে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে ফজল মসজিদের কাছে তার বাসস্থান ছিল। প্রবীণরা সবাই তাকে চেনেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে ফজল মসজিদে জুমুআর নামাযে আযান দেওয়ার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। মরহুম ফজল মসজিদ, লন্ডন ও পাটনী জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯৫ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি জীবনোৎসর্গ করেন এবং বিগত ২৯ বছর ধরে তিনি যুক্তরাজ্যে অবৈতনিকভাবে প্রথমে ওকালতে তবশীরে এবং পরে প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিসে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর একদিন আগেও তিনি যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত অফিসে কাজ করতে থাকেন আর এরপর নামায পড়ে বাসায় ফিরেছিলেন। তিনি নিয়মিত পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত, নীরব প্রকৃতির, সহানুভূতিশীল, মিশুক, পুণ্যবান, আন্তরিক এবং বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতও করেছিলেন। স্ত্রী ছাড়াও তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে এবং অনেক পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী রয়েছে। তিনি যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের মামাও ছিলেন। মহান আল্লাহ্ তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন। এটি জানাযা হাযের, যা ইনশাআল্লাহ্ পড়া হবে।

অন্য যেসব গায়েবানা জানাযা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ডা. মির্জা মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের জানাজা। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পৌত্র এবং ডা. মির্জা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব ও মাহমুদা বেগম সাহেবার পুত্র ছিলেন আর হযরত নবাব মোবারকা বেগম সাহেবার দৌহিত্র ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি রাবওয়া থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন, পরে তিনি লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস করেন। কিছুকাল রাবওয়ার হাসপাতালে কাজ করেন তারপর পড়াশোনার জন্য যুক্তরাজ্যে আসেন এবং ১৯৭০ সালে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস এডিনবার্গ থেকে স্নাতকোত্তর করেন এবং এফআরসিএস পাস করেন। তিনি যেহেতু ওয়াক্‌ফ ছিলেন, (তাই পাকিস্তানে) ফিরে যান এবং সেখানে ফযলে উমর হাসপাতালে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রায় ৫০ বছর ফযলে উমর হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সেখানে যাঁরা কাজ করেছেন, নুসরাত জাহার অধীনে যেসব চিকিৎসক কাজ করেছেন, অর্থাৎ ওয়াকেফীনে জিন্দেগী ডাক্তারদের মাঝে তিনি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। হয়ত ডা. মির্জা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব এর চেয়েও অধিক সময় কাজ করে থাকবেন। যাহোক তিনি ৫০ বছর দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ওয়াকফে জাদীদ বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করেন আর আমৃত্যু তিনি ওয়াকফে জাদীদ বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

তার স্ত্রী লিখেন, তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। সুখ বা দুঃখের কোনো উপলক্ষ্যেই বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন এবং আমার বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ তিনি কখনো ছেড়েছেন, এমনটি আমার মনে পড়ে না। এছাড়া দায়িত্বভারও নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিতেন। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই শৈথিল্য

দেখাননি। পরিবারের যত বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ছিলেন তদের সবার চিকিৎসা করার তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অসুস্থদের খোঁজখবর নিতেন। এভাবে অভাবীদের সব ধরনের সাহায্য করতেন। কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে তিনি কখনোই খালি হাতে ফেরাননি। অনেক মেয়ের পড়াশোনা করিয়েছেন এবং বিবাহ অবধি তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। কোনো কোনো মেয়ে তো আমাকেও লিখেছে যে, তারা তার ঘরে থাকত। তিনি নিজ কন্যার ন্যায় তাদের লালনপালন করে তারপর তাদের বিয়ে দিয়েছেন। অনেক রোগীকে ফি না নিয়েই চিকিৎসা করতেন। এ বিষয়েও অনেকেই আমাকে লিখেছে, বরং নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঔষধ এবং নগদ অর্থও দিয়ে দিতেন। খলীফাদের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল। খলীফাদের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের সাথে অনেক বেশি সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। সন্তানদেরও এ বিষয়ে তাগাদা দিতেন আর নিজের জীবনেও এটি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আমার চেয়ে বয়সে ছয়-সাত বছর বড় ছিলেন। কিন্তু (তা সত্ত্বেও) খলীফা হওয়ার পর সর্বদাই আমার প্রতি তার মাঝে শ্রদ্ধা ও ভক্তি লক্ষ্য করেছি। বরং এর পূর্বেও যখন আমি নাযেরে আলা ছিলাম তখনও অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভক্তিপূর্ণ আচরণ করতেন। তার সহধর্মিণী লিখেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর স্ত্রীর অন্তিম শয্যায় একদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ফোন আসে যে, ডাক্তার মুবাশ্বেরকে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। তিনি বলেন, এ খবর শুনে রাতারাতি তিনি (লন্ডনের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়েন আর তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শ্রদ্ধেয়া হযরত আসেফা বেগম সাহেবার মৃত্যুতে বলেছিলেন, মুবাশ্বের আমাকে লিফটের কাছে নিতে এলে আমি মুবাশ্বেরকে দেখতেই বুঝতে পারি, আমার স্ত্রী আর নেই, কেননা আমি জানি, অসুস্থ অবস্থায় মুবাশ্বের তাকে কখনো একা পরিত্যাগ করত না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর অসুস্থতার সময়ও তিনি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে আসা যাওয়া করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও একস্থানে তাঁর অসুস্থতার সময় তার সেবার কথা উল্লেখ করেছেন।

তার স্ত্রী লিখেন, একবার তার বিরুদ্ধে কোনো ভুল অভিযোগ করা হয় যার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তখনও তিনি যুগ খলীফার ও নেযামের সম্মান করেন এবং কোনো ধরনের অযৌক্তিক কথা বা আচরণ করেন নি। কমিটি পূর্ণ তদন্ত করার পর তাকে নির্দোষ আখ্যায়িত করে। তার বড় ছেলে লিখেন, চিনিওট এবং এর আশপাশের এলাকার অনেক বিরোধী গোপনে তার বাড়িতে এসে চিকিৎসা নিত। তার অনেক অ-আহমদী রোগী ছিল, এ সম্পর্কে আমিও জানি। অত্র অঞ্চলে তিনি অসংখ্য মানুষের চিকিৎসা করেছেন। তাই এ অঞ্চলে রাবওয়া এবং হাসপাতালেরও অনেক খ্যাতি ছিল।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে ঔষধ সেবনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চামচ ব্যবহার করতেন হযরত আম্মাজান (রা.) সেই চামচটি হযরত উম্মে নাসের সাহেবাকে দিয়ে বলেন, যে ছেলে ডাক্তার হবে তাকে দিবে। এটি একটি ছোট চায়ের চামচ ছিল। অতএব সেই চামচ মরহুমের পিতা মির্যা মুনাওয়ার আহমদ সাহেব পেয়েছিলেন এবং তার পরে সেই চামচটি মরহুমের কাছে ছিল। ডাক্তার মুবাশ্বের সাহেব মাঝে মাঝে বরকতের খাতিরে তার রোগীদেরকেও সেই চামচ দিয়ে ঔষধ পান করাতেন।

(তার মৃত্যুতে) সমবেদনা জানানোর জন্য আসা লোকদের মধ্যে সকল শ্রেণির মানুষ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক বড় একটি সংখ্যা দরিদ্র শ্রেণির লোক ছিল আর তারা বার

বার বলছিল, মিয়া সাহেব আমাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ছিলেন। তিনি তাদের কারো চিকিৎসা করেছেন আর কাউকে অন্য কোনো উপায়ে সাহায্য করেছেন। অত্র অঞ্চলে অনেক কৃষক রয়েছে। তাদের স্ত্রী, বোনেরা চিকিৎসার জন্য তার কাছে আসত। সেসব কৃষক এসে সমবেদনা প্রকাশ করে বলেছে যে, তিনি আমাদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন! এসব অ-আহমদীরাও এসে কেঁদে কেঁদে বলছিল, আমাদের মাথার ওপর থেকে বাবার ছায়া উঠে গেছে। আমাদের হাসপাতালের কর্মচারীদের অধিকাংশ আমাকেও লিখেছে যে, আমাদের হাসপাতাল এতিম হয়ে গেছে আর সবাই খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছে, আফসোস প্রকাশ করেছে। যাহোক, সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, দরিদ্রদের খেয়াল রেখেছেন। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছেন, জানাযা যাওয়ার সময় কেউ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও এর সত্যায়নস্থল বানান।

ডাক্তার মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, আমার জানামতে জামা'তে সবচেয়ে বেশি সময় সার্ভিস প্রদানকারী ডাক্তারের সম্মান তিনিই লাভ করেছেন আর এটি ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। তিনি আরও লিখেন, তিনি যে যুগে কাজ শুরু করেছিলেন সে যুগে কোনো সাহায্যকারী কম্পাউণ্ডার বা সহকারী ছিল না। ঘরের ছিটকানি নিজেকেই লাগাতে হতো আবার নিজেকেই খুলতে হতো। রোগীকেও ডাকতে হতো। এছাড়া অন্যান্য কাজও করতে হতো। অপারেশন থিয়েটারও একাই সামলাতে হতো। এনেস্থেশিয়া দেয়ারও কেউ ছিল না। সবকিছু নিজেকেই করতে হতো। এরপর তিনি ধীরে ধীরে স্টাফদের প্রশিক্ষণ দেন। অতঃপর হাসপাতালের অনেক সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন, ইনফেকশনের অনুপাতও অন্য যে-কোনো প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কম ছিল। অধিকাংশ রোগী সফল চিকিৎসা করে হাসপাতাল থেকে বিদায় নিত। যাহোক, তিনি দেখেছেন, আহমদী অ-আহমদী সব রোগীর তিনি খুবই সম্মান করতেন। আর এটি ব্যক্তিগতভাবে আমিও জানি।

সরকারী হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার মুনীর মুবাশ্বের সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসা সেবার গণ্ডি শুধু রাবওয়াই নয়, বরং আশপাশের সব অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। তিনি বলেন, আমার পুরো চাকরিজীবন রাবওয়ার আশপাশেই অতিবাহিত হয়েছে। ইনি রাবওয়ার সরকারী ছোট ছোট হাসপাতালে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, প্রায় সব গ্রাম ও সব শহরের অনেক লোক তার ভক্ত ছিল আর আমি যেমনটি বলেছি, অগণিত অ-আহমদী লোক তার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাতে এসেছে।

ডাক্তার নূরী সাহেব লিখেছেন, রাবওয়ায় একাকী বসবাসকারী জনৈক এক বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তার মোবাশ্বের সাহেবের ছবি নিজের ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ডাক্তার নূরী সাহেব তাকে দেখতে যান। খুবই শদ্ধা ভক্তির সাথে উক্ত অসুস্থ ব্যক্তি বলেন, ডাক্তার মোবাশ্বের সাহেব অধিকাংশ সময় আমার ঘরে এসে আমার শরীর-স্বাস্থ্য ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। আল্লাহ্ তাকে ভালো রাখুন। এটি তার জীবদ্দশার সময়কার কথা। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সেবা এবং রোগীদের অনুভূতি ও সমবেদনা সংবলিত এত চিঠি আছে যে, এগুলো সব বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। খিলাফতের সাথে অসাধারণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল, যেমনটি আমি বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অপার ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং আপন প্রিয়জনদের মাঝে তাকে স্থান দিন।

দ্বিতীয় জানাযা গায়েব হলো, ইসলামাবাদের সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী মুকার্‌রমা সৈয়্যদা আমাতুল বাসেত সাহেবার। কিছুদিন পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُوْنَ। মরহুমা ছিলেন ডাক্তার সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের পৌত্রী এবং মোহতরম সৈয়্যদ আব্দুর রাজ্জাক শাহ্ সাহেবের কন্যা আর হযরত উম্মে তাহের (রা.)-এর ভাতিজি। মরহুমার পিতা আব্দুর রাজ্জাক শাহ্ সাহেব প্রথম আইরিশ আহমদী মহিলা হানিফা শাহ্ সাহেবাকে বিয়ে করেছিলেন যার পূর্বনাম ছিল ক্যাথলিন ও'ব্রায়েন। এই বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৫ সনে কেনিয়ার নায়রোবিতে। এরপর মরহুমার মা পাকিস্তানে চলে আসেন। শাহ্ সাহেব পাকিস্তানের সিন্ধুতে পদায়িত হন আর সেখানে তিনি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। শাহ্ সাহেবের স্ত্রী আয়ারল্যাণ্ডবাসিনী হওয়া সত্ত্বেও এই ছোট গ্রামে অনেক কুরবানী করে জীবন যাপন করেন আর তাদের সন্তানরাও অনেক ত্যাগী মনমানসিকতার ছিল যাদের একজন ছিলেন এই মরহুমা আমাতুল বাসেত সাহেবা।

তার স্বামী সৈয়্যদ মাহমুদ শাহ্ সাহেব বলেন, মরহুমা নামায এবং বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করতেন এবং শৈশব থেকেই তার পিতার সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করে চলতেন এবং ধার্মিক মহিলা ছিলেন। সর্বদা দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা করতেন। পর্দার অনুশাসন অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্রসন্তান রেখে গিয়েছেন। তার এক ছেলে সৈয়্যদ বশীর আহমদ এখানেই (যুক্তরাজ্যে) থাকেন। আরেক ছেলে আছে সৈয়্যদ শাহেদ আহমদ। তার কন্যা মজিদা মালিক আমেরিকায় থাকেন। তার কন্যা মজিদা মালিক আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার আহমদ মালেক সাহেবের স্ত্রী। তিনি বলেন, আমার মা সর্বজনপ্রিয় এবং সদা উৎফুল্ল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। তার সাথে যে-ই সাক্ষাৎ করত সে-ই তার ভক্ত হয়ে যেত। খিলাফতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। তিনি ছিলেন খুবই পবিত্র স্বভাবের, কুশলী এবং ভদ্র ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী। নিজের কোনো দুঃখ-কষ্ট কখনোই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন না। দরিদ্রদের সাহায্য আর দান খয়রাতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। দরিদ্র মেয়েদের বিয়ে-শাদীর জন্য সাহায্য, অভাবীদের বাড়িতে রেশন পৌঁছানো, এতিমদের পড়াশোনার খরচ বহন করা, দরিদ্রদের আহার করানো, মোটকথা নিজের সময় তিনি আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের সাহায্য-সহযোগিতা করায় ব্যয় করতেন, সেটি দোয়ার আকারে হোক বা সদকা করার আকারেই হোক। অধিকাংশ সময় আল্লাহ্ তা'লা এবং ঐশী সাহায্যের বিষয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন এবং তার বন্ধুত্বও এমন লোকদের সাথে হতো যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসত। তার সাথে আল্লাহ্ তা'লারও এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করতেন, আর অনেক বিষয়ে পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগাম সংবাদও দিয়ে দিতেন। চরম অসুস্থতায়ও তিনি নামায পরিত্যাগ করেননি আর সর্বদা ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখতেন, পাছে নামায ছুটে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় জানাযা গায়েব হলো শরীফ আহমদ বন্দেশা সাহেবের, যিনি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের চক নং ২৬১ আরবে আদুওয়ালী জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনিও গত কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলা রহমতুল্লাহ্ বন্দেশা সাহেব বলেন, আমাদের দাদার দুই-তিন মাস বয়সে দাদার পিতামাতা ও অন্য সব নিকট আত্মীয়স্বজন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে প্লেগের সময় মৃত্যু

বরণ করে। তখন দাদার দূর-সম্পর্কের এক আহমদী পরিবার তার প্রাথমিক লালন পালন করেন। এরপর বাটালা তহসীলের এক বিচারকের রায় অনুযায়ী দাদার বেশি কাছের আত্মীয় এক আহমদী পরিবারে তিনি লালিত পালিত হন। এভাবে তিনি (অর্থাৎ শরীফ আহমদ সাহেবের বাবা) আহমদী পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত থাকেন। মরহুম প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত গ্রামে জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অগণিত গুণাবলীর অধিকারী, দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইবাদতে উন্নত মার্গের অধিকারী, অসহায় এবং বিশেষত নিকটাত্মীয়দের সাহায্যকারী, খিলাফত ও জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পাঁচ পুত্র আর তিনজন কন্যা তিনি রেখে গিয়েছেন। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তার এক ছেলে রহমতুল্লাহ্ বন্দেশা সাহেব মুবাল্লেগ সিলসিলাহ, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন, আর তার গ্রামের বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে পিতার জানাযা ও দাফনের কাজে যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সব সন্তানদের তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)